UNOFFICIAL TRANSLATION
by Aby Sayeed, Bonik Barta www.bonikbarta.com

স্টকহোম স্টেটমেন্ট

বিশ্বব্যাংকের চার সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদসহ ১৩ জন অর্থনীতিবিদ সুইডেনের স্টকহোমে দুদিনের (১৬-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬) এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলÑ আজকের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন। বৈঠকটি আয়োজন করেছিল সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এজেন্সি (সিডা) ও বিশ্বব্যাংক। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর সাবিনা আলকিরে (অক্সফোর্ড), প্রফেসর প্রণব বর্ধন (বার্কলে), প্রফেসর ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু (নিউইয়র্ক), প্রফেসর হারুন ভোরাত (কেপ টাউন), প্রফেসর ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ফ্রাঁসোয়া বরগিগন (প্যারিস), প্রফেসর অশ্বিনী দেশপান্ডে (দিল্লি), প্রফেসর রবি কানবুর (ইথাকা), প্রফেসর ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাস্টিন ইফু লিন (বেইজিং), প্রফেসর ক্যালে মোনে (অসলো), প্রফেসর জাঁ-ফিলিপ্পে প্লাতিউ (নামুর), প্রফেসর জেইমি সাভিদ্রা (লিমা), নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ (নিউইয়র্ক) এবং প্রফেসর ফিন ট্রাপ (হেলসিঙ্কি ও কোপেনহেগেন)। বৈঠক শেষে অর্থনীতিবিদরা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়গুলোয় ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন, তা নিয়ে একটি বিবৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। এটিই স্টকহোম স্টেটমেন্ট।

উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ

অশান্ত সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে আজকের বিশ্বকে। বৈশ্বিক শক্তিগুলো প্রতিশ্র“তি ও বিপদ দুটো ধরেই এগোচ্ছে। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি জীবনমান উন্নয়নের প্রতিশ্র“তি দিচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে শ্রম বাস্তুচ্যুত ও যুব বেকারত্বের বিপদও তৈরি করছে। বাণিজ্য ও বৈশ্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রবৃদ্ধিকে তাড়িত করছে এবং অনেক নিুআয়ের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করেছে। কিন্তু এসব দেশের অনেক গোষ্ঠীই পেছনে পড়ে থাকছে। একই কথা উন্নত দেশগুলোর জন্যও সত্য। এসব দেশে

অনেকেই বিশ্বায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর ওপর যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যে আটকে পড়া দেশগুলোয় প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার মান বলতে গেলে ধসে পড়েছে। দেশগুলোর মধ্যে বাড়তে থাকা বৈষম্য সামাজিক মেলবন্ধন ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে হুমকি তৈরি করছে। পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ুগত পরিবর্তন পৃথিবীকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে এবং ক্রমে বাড়তে থাকা এ বিপদ মোকাবেলার জন্য সমন্বিত বৈশ্বিক উদ্যোগের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। দ্রুত নগরায়ণ পুঁজি থেকে উৎপাদনশীলতার মুনাফা তুলে নেয়ার হাতছানি দিয়ে ডাকছে ঠিকই কিন্তু শহুরে বস্তি, দারিদ্র্য ও বিবাদের মতো সমস্যাগুলোও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এর কোনো কিছুই বিশ্বে আয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যে বিশাল অগ্রগতি হচ্ছে, তা দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না। আমরা এ অর্জনগুলো উদযাপন করছি এবং নীতিনির্ধারকরা যে সন্দেহাতীত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন, তার দিকে চেয়ে রয়েছি। এসব চ্যালেঞ্জের সফল জবাব নিহিত রয়েছে এমন নীতি নকশাকরণের মধ্যে, যা উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বিপদ নয় বরং প্রতিশ্র“তি রক্ষার জন্য পরিকল্পনা পরিচালনা করবে। এ ধরনের নীতি নকশা করতে হলে প্রয়োজন উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টি, অতীত এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের সফলতা ও ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া এবং একটি দীর্ঘ সময় ধরে পরিসংখ্যাগত বিশ্লেষণ পুঞ্জীভূত করা।

এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রচলিত অর্থনীতির কিছু সুপারিশ এখন আর কাজে লাগছে না। রাজস্ব ভারসাম্য ধরে রাখা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি ব্যবহার, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং এর পর বাকি কাজটা বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার মতো সাধারণ নীতি-নির্দেশকগুলোর ওপর নীতিনির্ধারকরা এখন ভরসা করতে পারেন না। ধরে নিলাম, এ ধরনের পদ্ধতি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, যা ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য কমায় কিন্তু এটা কোনো যুক্তিসিদ্ধ প্রতিশ্র“তি নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বর্তমান কিছু বিপজ্জনক অবস্থার পেছনে ওইসব পুরনো উপদেশের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিই দায়ী।

এ বিবৃতির উদ্দেশ্য নীতির জন্য একটি প্রতিচিত্র তৈরি করা নয়, বরং একগুচ্ছ মূলনীতি তৈরি করা; যা আমরা আশা করি দেশের নীতি গঠনে সহায়তা করবে, বৈশ্বিক

আলোচনাকে উসকে দেবে এবং বহুপক্ষীয় নীতি নকশায় সাহায্য করবে। বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও বিশ্বায়নের বিশ্বে এ ধরনের নীতির ভীষণ প্রয়োজন।

জিডিপি প্রবৃদ্ধিই শেষ কথা নয়

আমরা বিশ্বাস করি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য নীতির প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু অবশ্যই নীতির কাজ এখানেই শেষ হয় না, বরং নীতি নিজেই হলো একটি উপায়, যার মাধ্যমে সম্পদ তৈরি করা যায়; যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তার মতো সামাজিক বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন এবং একই সঙ্গে ভোগ তৈরি করতে প্রয়োজন। ব্যক্তিগত কল্যাণ বহুমাত্রিক এবং শুধু আয়ের দিক থেকে নয়, বরং সমাজের দিকে থেকে মূল্য রয়েছে এমন সব মাত্রিকতার উন্নতির লক্ষ্য হওয়া উচিত নীতির। যেমনÑ প্রি-স্কুল শিশুদের জন্য ভালো পুষ্টি সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে এবং সবার মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং এগুলো পূরণ সাধ্যের মধ্যে রয়েছে। যদি জায়গামতো সঠিক নীতি না থাকে, তবে সব কল্যাণমূলক কাজের ক্ষতি মেনে নিলেÑ যার মধ্যে স্থানীয় পরিবেশ ও বৈশ্বিক জলবায়ুর অবনতি অন্যতমÑ ব্যক্তিগত কল্যাণ আসতে পারে। এটাও মনে রাখতে হবে যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিজে যেচে গিয়ে অত্যাচারকারীর নিয়ম দূর ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করবে না। সাধারণত এগুলো বন্ধের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত হস্তক্ষেপ।

এটা স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন যে, সব অর্থনীতির জন্য একটি একক বিধান উপযুক্ত বলে গণ্য করা ঠিক না। দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন, যা ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সত্য। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন আকাক্সক্ষা থাকে এবং কোনটি কাজ করবে আর কোনটি করবে না, তা নির্ধারণেও ভূমিকা রাখে। অতীতে সব দেশের জন্য একটি অভিন্ন নীতি কোড (কিছু ধনী দেশে যা তৈরি হতো) ব্যবস্থাপত্র দেয়ার প্রবৃত্তি ছিল। বিস্তৃত নীতি তত্ত্ব রয়েছে, যেগুলোয় আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নীতিতে বৈচিত্র্য ও প্রসঙ্গ নির্দিষ্টতার সুযোগ রাখতে হবে।

উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে

আমরা বিশ্বাস করি, উন্নয়ন যেন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, তা নিশ্চিত করতে নীতির সাহায্য করা উচিত এবং লিঙ্গ, জাতি বা অন্য কোনো

সামাজিক নির্দেশক দ্বারা চিহ্নিত জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। কল্যাণের যে ক্ষেত্রগুলোয় চরম বঞ্চনা করা হয়, তার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া উচিত, বিশেষ করে ব্যক্তিপর্যায়ে যারা বিভিন্ন মাত্রায় বঞ্চিত হয়ে আসছেন। কিন্তু শুধু সবচেয়ে বেশি বঞ্চিতদের দিকে দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট নয়। ধনী ও গরিবের মধ্যকার সৃষ্ট ব্যবধানের দিকে দৃষ্টি দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক দশকগুলোয় আয় ও সম্পদের বৈষম্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক সেবা খাতে সুবিধা নেয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে বৈষম্য বেড়েছে, তা নীতিগতভাবে অসমর্থনীয়। এ ধরনের বৈষম্য সামাজিক ঐক্যে চিড় ধরায় এবং অভিজাতদের করা নীতির জটিলতা আরো বৃদ্ধি করে, ফলে বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। উচ্চবৈষম্য গরিবদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং একই সঙ্গে গণতন্ত্রকে আরো দুর্বল করে তোলে। নারী ও ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এদের নিজেদের অধিকার বলেই প্রাধান্য পায়, অন্যদিকে এটি অর্থনৈতিক দক্ষতার জন্য একটি ভালো ভিত্তিও গড়ে দেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক সংঘর্ষ থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং যেখানে উন্নয়ন নীতি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, সেখানে সামাজিক সংঘর্ষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা জোরালো। সার্বিকভাবে উন্নয়নের একমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই প্রকার হলো সামগ্রিক বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।

পরিবেশগত ধারণক্ষমতা একটি প্রয়োজন, কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়

প্রতিটি দেশ ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট হিসেবে পদ্ধতি নেয়া ও বাস্তবায়ন ভিন্ন হলেও আমরা বিশ্বাস করি, উন্নয়ন নীতিনির্ধারণে পরিবেশগত ধারণক্ষমতাকে মূল লক্ষ্য হিসেবে অবশ্যই ধরা উচিত। এটা সরাসরি আঞ্চলিক পরিবেশগত অধঃপতনের সঙ্গে জড়িত, যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে আয় প্রবৃদ্ধি কল্যাণ ও উন্নয়নের মিথ্যা নির্দেশক তৈরি করতে পারে। এর ওপর সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা, পরিবেশগতভাবে সংশ্লিষ্ট অভিবাসন নিরাপত্তাহীনতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে, যা উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর টেকসহিতার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি হুমকি এবং সমানভাবে অনেক দেশের জীবিকা, কৃষি ও আবাসস্থলের জন্য মধ্যম মেয়াদি হুমকি। বৈশ্বিক পর্যায় থেকে সবার আগে প্রশমন বা নিরসন প্রচেষ্টাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। আর এ ধরনের কাজে নীতি গ্রহণের জন্য সক্রিয় হস্তক্ষেপ এবং জাতীয় ও

আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। এগুলো এমন সমস্যা যে, এর সমাধান মুক্ত বাজারের হাতের //////ওপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। রাষ্ট্রের রেগুলেটরি হস্তক্ষেপ এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের নীতি সমন্বয় অপরিহার্য।

বাজার, রাষ্ট্র ও কমিউনিটির মধ্যে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা

এ লক্ষ্যগুলো পূরণ ও বিশ্বসম্প্রদায় যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, তার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন নীতিকে বাজার, রাষ্ট্র ও কমিউনিটির মধ্যে একটি সুবিচারপূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা মেনে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ যে বাজার হচ্ছেÑ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার জন্য এমন একটি ক্রিয়াশীল প্রবিধানসংবলিত ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োজন, যা সম্পদের কার্যকর অর্থনৈতিক বরাদ্দের প্রতিশ্র“তি পূরণ করবে। এমনকি যেখানে বাজার দক্ষতার সঙ্গে প্রতিশ্র“তি পূরণ করে, সেখানেও অন্তর্ভুক্তিকরণ ও ইকুইটির জন্য প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি তাদের নেই। যেমনটা আমরা জানি, দুর্ভিক্ষ মুক্ত বাজার কার্যকারিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। গত ২৫ বছরে অবাধ বাজারের প্রতি টান তৈরি হয়েছে, যা অর্থনৈতিক সংকট, বৈষম্য ও অ-টেকসহিতার অসমর্থনীয় মাত্রাসহ বর্তমানে আমরা যে বিশ্বে বসবাস করছি, তার অনেকগুলোর সমস্যার ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

বাজারের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা উপলব্ধি করছি যে, রাষ্ট্রের নিজেরই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। এমন অনেক পথ রয়েছে, যা ধরে দেশগুলো বাজারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যেখানে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কোঅপারেটিভ, অ্যাসোসিয়েশন ও এনজিওর মতো অসংখ্য আকারেও ভূমিকা পালন করতে পারে, যা সভ্য সমাজ গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা বাজার বা সমাজের ওপর ছেড়ে দেয়া অপেক্ষাকৃত ভালো। অনেক সময় দেখা যায়, কমিউনিটি পর্যায়ের স্থানীয় গ্র“পগুলোর নেয়া পদক্ষেপ বঞ্চিতদের কল্যাণে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। যদিও এটা ভুলে গেলে চলবে না, সব পর্যায়ে স্থানীয় কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানগুলো সেকেলে শক্তি ও সভ্য সমাজের সংস্থার হাতে বন্দি, তবে এগুলো সামাজিক সঙ্গতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমরা আবারো বলছি, এ খেলার নিয়ম ঠিক করে দেয়া এবং একটি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, যা ধরে বাজার ও কমিউনিটি উন্নতি, উৎপাদন ও বৃদ্ধি করতে পারবে, তার জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য। সামাজিক সংহতির আরো দৃঢ় রূপ ও আস্থা খেলাকে নিয়ম মেনে চলতে আরো ভালোভাবে সাহায্য করবে এবং এর ফলাফল হিসেবে আমরা পাব কম বৈষম্য, প্রবৃদ্ধি একসঙ্গে বাড়বে এবং সবদিকে কল্যাণ আনবে। এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যেখানে বাজার ভালো করে না। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলোÑ অর্থায়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ এবং সেসব জায়গায়, যেখানে স্পষ্টত অন্তর্ভুক্তিমূলক শর্ত রয়েছে, যেমনÑ নারীর ক্ষমতায়ন, ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদান, অতিরিক্ত সম্পদের দিকে নজর দেয়া এবং আয়বৈষম্য। এখানেও রাষ্ট্রের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। শিল্পনীতি তৈরি, কার্যকর কৃষি ও সেবা খাত নীতি প্রণয়নেও রাষ্ট্রকে ভূমিকা রাখতে হয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই বৈষম্য বৃদ্ধির দুষ্টচক্র প্রতিরোধ করতে হবে। কেননা এটি রাষ্ট্রকে বন্দি করে ফেলে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য জোরদার করে।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রদান

অনেক প্রথাগত নীতি উপদেশের মূলে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা। অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিশীল অর্থনীতি বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়, যার সঙ্গে কল্যাণের হারও বাড়ে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থাপনা নীতি অর্থনীতিকে অবিচলিত রাখে এবং এখন নেয়া নীতি কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদি তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগ দেয়, যেমনÑ রাজস্ব ও বহিঃআর্থিক টেকসহিতা নিশ্চিত করা। রাজস্ব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য দেশগুলোর উচিত শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির সময়কে ব্যবহার করা। তখন তারা এমন একটি অবস্থানে থাকবে যে যখন প্রয়োজন পড়বে তখনই এ ওষুধ প্রয়োগ করতে পারবে। /////যদিও যেখানে দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য প্রচলিত অর্থনীতি সঠিক, কিন্তু নীতিনির্ধারকরা প্রায়ই বাজেট ভারসাম্যের প্রতিমা তৈরিতেই আটকে যান।////////

এটা মেনে নিতে হবে যে, আর্থিক প্রণোদনা ও সরকারি বিনিয়োগ স্থবিরতার ফাঁদ এড়ানোর জন্য প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ,

যতক্ষণ দায় বা ঋণ সাবধানতার সঙ্গে পরিচালিত হয় এবং নগদীকরণের মুদ্রাস্ফীতজনিত ফল অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকারি বিনিয়োগ অবকাঠামো তৈরি ও সবুজ প্রযুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ,//////// যেখানে মুনাফা আসতে এত দেরি হয় যে তা বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে না। এছাড়া দীর্ঘ কার্যকর পদক্ষেপ মুদ্রানীতির ঘাটতি পূরণ করতে পারে উন্নয়ন বুদ্বুদ (বাবল) নিরুৎসাহিত করে, সম্ভাব্য অস্থিতিশীল মূলধন গমন/// সহনীয় করে এবং বাহ্যিক অতিরিক্ত দায় প্রতিরোধ করে।

বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও বৈষম্যের প্রভাবের প্রতি মনোযোগ দেয়া

নীতি তৈরির সামনে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের প্রযুক্তির উন্নয়ন। নতুন প্রযুক্তি বৈশ্বিক শ্রমবাজারের মধ্যে সংযোগ তৈরি করছে, যার ফলে উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিকরা বৈশ্বিক বাজার ও ভোক্তাদের জন্য কাজ করছে অথচ তাদের অন্য কোথাও যেতে হচ্ছে না। এ উন্নয়ন শ্রমিকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে কিন্তু একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে। উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মধ্যে এটিকে 'শ্রম বনাম শ্রমিক সমস্যা' বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা বাড়ছে, উন্নত দেশগুলোর শ্রমিক স্বার্থকে উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। বাস্তবতা হলো, এটি শ্রম বনাম মূলধন সমস্যা, অথচ এখানে তা উপেক্ষিত হচ্ছে। অটোমেশন, রবোটিকস প্রযুক্তির উন্নয়ন ও শ্রমবাজারের বিশ্বায়ন শুধু শ্রমকে স্থানচ্যুতই করছে না, এটি করপোরেশন ও মেশিনের মালিককে উচ্চ মুনাফা এনে দেয়ার বদলে শ্রমিকের আয় কেড়ে নিচ্ছে। এর উদ্বেগজনক পরিণতি সম্পর্কে অবশ্যই এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তা করতে হবে বৈশ্বিক শ্রম বনাম শ্রমিকের তীব্র লড়াইয়ে রূপান্তর করা ছাড়াই।

এ পরিস্থিতি তিনটি নীতি বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। প্রথমত. আমাদের অবশ্যই মানবসম্পদে বিনিয়োগ করতে হবে এবং দক্ষতা বাড়াতে হবে এমন পথে, যা প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে এর সম্পূরক হয়ে উঠবে এবং শ্রম আয় বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয়ত. দেশগুলোর মধ্যে আয় স্থানান্তরের নতুন পদ্ধতি চালু করতে হবে। জিডিপিতে মজুরির অংশ কমাকে অবশ্যই প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আসা অনিবার্য পরিণতি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। সরকারকে এ অসমতা দূর করতে কর ও মুনাফা বন্টনের জন্য

একটি সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে এবং তাদের এ খেলার নিয়ম তৈরি করতে হবে। যেমনÑ প্রতিযোগিতা আইন ও শ্রম আইন শক্তভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, যা শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের কথা বলার অধিকার শক্তিশালী করবে। সর্বশেষে এ পরিস্থিতি একটি বহু দেশভিত্তিক নীতিনির্ধারণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এটি বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দিয়েছে দেশগুলোর মধ্যে নীতি সমন্বয়কে উৎসাহিত করতে এবং এমন নীতির প্রচারণা চালাতে, যা শুধু ধনী ও শিল্পোন্নত দেশের স্বার্থ দেখবে না, বরং উদীয়মান দেশগুলোর স্বার্থও দেখবে। কেননা প্রায়ই দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এ দেশগুলো মত প্রকাশ থেকে বঞ্চিত হয়।

সামাজিক আদর্শ ও মনোভাবের গুরুত্ব রয়েছে

বেশির ভাগ প্রচলিত অর্থনীতি মনে করে, সামাজিক আদর্শ ও মনোভাব আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে খুব কমই প্রভাব ফেলে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বিষয়টি এমন নয়। আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, একটি অর্থনীতি কীভাবে পারফর্ম করবে, তাতেও প্রভাব ফেলে। একটি সমাজ, যেখান বসবাসরত নাগরিকরা একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তা অর্থনীতিতে ভালো করে অন্য সমাজের তুলনায়, যেখানে এটি অনুপস্থিত। ////অপশনের একই সেট যখন সেটা মানুষের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়, উদাহরণস্বরূপ ভিন্ন ক্রমে বা ভিন্ন ডিফল্ট অপশনের সঙ্গে, তখন মানুষ কী পছন্দ করবে তা অন্য রকম বা ভিন্ন হতে পারে।/// সরকারের উচিত নিজেদের প্রোগ্রাম ও সেবা আরো কার্যকরভাবে চালাতে এ নতুন অন্তর্দৃষ্টি ও নতুন যন্ত্র ব্যবহার শুরু করে দেয়া। দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি খাতের ফার্ম ও করপোরেশনগুলো নিজেদের স্বার্থ ও মুনাফার জন্য মানুষের মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক অনুরাগ সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যবহার করে আসছে। সরকার যদি চায় শিক্ষা ও স্বার্থ////////////////// সেবা কার্যকরভাবে প্রদান করতে এবং ন্যায্যভাবে কর আহরণ করতে, তবে সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের বর্ধিত জ্ঞানকে জনসাধারণের ভালোর জন্য সচেতনভাবে নীতিনির্ধারণীর সঙ্গে একত্রিত করতে হবে। সামাজিক আদর্শ ও মনোভাব দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে

পারে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে রাষ্ট্রের স্পষ্ট মনোভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আদর্শ ও মনোভাব হলো প্রতিটি সমাজের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার ফল।

বৈশ্বিক নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব

জাতীয় সরকারের নেয়া উন্নয়ন নীতির ওপর ক্রমে বৈশ্বিক শক্তিগুলোর প্রভাব বাড়ছে। তারা সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ উপস্থাপন করছে এবং পালাক্রমে তারা নিজেরাই অন্য দেশের নেয়া পদক্ষেপ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

উচ্চ আয়ের দেশের মুদ্রানীতি উন্নয়নশীল দেশের মূলধন প্রবাহের প্রত্যাশার ওপর প্রভাব ফেলে। ধনী দেশগুলোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নীতি (যদিও এগুলো প্রথমে তাদের ওপরই প্রভাব ফেলে) চূড়ান্তভাবে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে, যা ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সংকটের মাধ্যমে সচিত্ররূপে দেখা গেছে। করস্বর্গের নীতি ও নিয়মকানুন সব দেশের, বিশেষ করে নিুআয়ের দেশগুলোর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নেয়া নীতিতে অর্থায়নের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের সামর্থ্যরে ওপর প্রভাব ফেলছে। এক দেশের বাণিজ্য নীতি অন্য দেশের রফতানি নীতির ওপর প্রভাব ফেলে। উচ্চ আয়ের দেশগুলোর অভিবাসন নীতি নিুআয়ের নাগরিকদের নিজেদের আরো ভালো করার সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলে। নিজেদের ভালো করতে গিয়ে তারা রেমিট্যান্স ও জ্ঞান বণ্টনের মাধ্যমে নিজের দেশের উন্নয়নে সহায়তা করে। এ ধরনের সবক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি দেশের কারণে অন্য দেশের ওপর সমান্তরাল প্রভাব পড়ে। এজন্য বিশ্বের সবচেয়ে বঞ্চিত নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে প্রতিটি দেশের এবং দায়িত্ব রয়েছে এদের জন্য সুযোগ তৈরি করার।

চুক্তি ও সংস্থা, যেগুলোর সঙ্গে অনেক দেশ জড়িত থাকে, তা আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো সমাধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এ চুক্তি ও সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা এবং ধরে রাখা খুবই কঠিন। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্যারিস চুক্তি শুরুটা ভালো করেছে। বিশ্ব অপেক্ষা করছে সব দেশ বায়ু নির্গমন নিয়ে যে প্রতিশ্র“তি দিয়েছে এবং নিুআয়ের দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন প্রচেষ্টাকে,////////// প্রশমন ও অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য ধনী দেশগুলো যে প্রতিশ্র“তি দিয়েছে, তা বাস্তবায়নের। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় প্রচলিত উৎসগুলো থেকে উন্নয়ন সহায়তা কমে গেছে এবং

নতুন দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তার জন্য নেয়া দশমিক ৭ শতাংশ অধরা লক্ষ্য পূরণে কয়েক দশক আগে বিশ্বসম্প্রদায় একমত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হলো, এ সহায়তা যেন সরাসরি উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং সেখানে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পায়, তা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে যে উন্নয়নশীল দেশগুলো যেন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোয় আরো ভালো প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যা নিশ্চিত করবে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের দিকে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নিয়মাবলি মনোযোগী।

আগামীর প্রত্যাশা

দেশগুলো যদি উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাজার, রাষ্ট্র ও কমিউনিটির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বাস্তবমুখী নীতি অনুসরণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি একসঙ্গে বৈশ্বিক শক্তির সীমাবদ্ধতা দূর করতে কাজ করে এবং নতুন সুযোগ অর্থাৎ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সদ্ব্যবহার করতে পারে, তবে বিশ্বে এমন উন্নয়ন আসবে, যা সবচেয়ে বঞ্চিতসহ সবার জন্য কল্যাণকর হবে। আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়তে পারি, যেখানে উন্নয়ন সবার মধ্যে বন্টিত হয়। অতীতে ভুল ও সফলতা একগুচ্ছ নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছে, যার ভিত্তিতে জাতীয় ও বৈশ্বিক স্তরের নীতি গ্রহণ করা যাবে। উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক নীতি নকশায় এ নীতিগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে প্রয়োগ করার এখনই সময়।

ভাষান্তর: আবু সাঈদ